62 গ্রামীণ পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ শেরপুর থানার দুটি গ্রামের একটি সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ১৯৯২)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. শিখা রানী সরকার, উপ-পরিচালক
এম.এ. (অর্থনীতি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এড, রাজশাহী
এম.এস.সি (কৃষি শিক্ষা) রিডিং, ইউ.কে.।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণার কাজটি হাতে নেয়া হয়ঃ

১. গবেষণাভুক্ত গ্রাম দু'টিতে মোট পরিত্যক্তা মহিলা কতজন রয়েছে তা জানা;

২. পরিত্যক্তা হওয়ার কারণগুলো উদঘাটন করা;

৩. পরিত্যক্তা মহিলা এবং আশ্রয় দাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া; এবং

৪. পরিত্যক্তা মহিলাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

গ) সারসংক্ষেপ

"গ্রামীণ পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা" (শেরপুর উপজেলার দু'টি গ্রামের একটি সমীক্ষা) শীর্ষক গবেষণাটি বগুড়া জেলার অন্তর্গত শেরপুর উপজেলাধীন রামনগর এবং কৃষ্ণপুর গ্রাম দু'টিতে পরিচালনা করা হয়। পরিত্যক্তা হিসেবে যে সমস্ত মহিলা তালাকপ্রাপ্তা এবং স্বামী থেকে পৃথকভাবে বসবাস করছে এমন মহিলাদের গবেষণার আওতায় নেয়া হয়েছে। দু'টি গ্রামে মোট ৩৫৪টি পরিবার রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ২২ জন পরিত্যক্তা মহিলা পাওয়া গেছে (৬.২১%)। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে।

অধ্যায়-১ এ ভুমিকা, গবেষণা উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি স্থান পেয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে অধ্যায়-২ এ। পরিত্যক্তা হওয়ার পেছনে যেসব কারণগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলোঃ দ্বিতীয় বিয়েতে যৌতুক বেশী পাওয়ার আশায়, ঘরজামাই থাকায় প্রতিবেশীরা কটুক্তি করায়, স্বামী কর্তৃক অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে না পারায়, বয়সের পার্থক্য এবং বাল্য বিবাহ, স্বামী এবং সতীনের সন্তান কর্তৃক প্রহার সহ্য করতে না পারায়, পুত্র সন্তান না হওয়ায়, স্ত্রী অসুস্থ বিধায় ইত্যাদি। কোন বয়সে পরিত্যক্তা হয়েছিল এবং কতদিন যাবত পরিত্যক্তা অবস্থায় রয়েছেন এ প্রসংগে দেখা যায় সর্বনিম্ন ১৯ বৎসর বয়সে এবং পরিত্যক্তা অবস্থায় রয়েছেন ১ বৎসর, সর্বোচ্চ ৪৯ বৎসর এবং পরিত্যক্তা অবস্থায় রয়েছেন ১৩ বৎসর পর্যন্ত। যৌতুক দিয়ে বিয়ে হয়েছে ৪৫.৪৫%। পরিত্যক্তা মহিলাদের স্বামী সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে যে মতামত পাওয়া গেছে তা যথাক্রমে ঃ স্বামী খুব খারাপ ছিল এবং মারধর করতো, সতীনের কথার প্রাধান্য, স্বামীর বয়স বেশী ছিল, বিষয়-সম্পত্তির জন্য লোভ ছিল, স্বামী ভাল ছিল কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধু পছন্দ ছিল না ইত্যাদি।

২২ জন জরিত্যক্তা মহিলার মধ্যে২১ জনই ভুমিহীন, মাত্র ১ জনের ০.০৪ একর বসতবাটিসহ ১.০০ একর কৃষিযোগ্য জমি রয়েছে। নিজস্ব জায়গা ও ঘর আছে এমন উত্তরদাতা ৯ জন, নিজস্ব জায়গা নেই কিন্তু ঘর আছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ১৩ জন। যারা এই পরিত্যক্তা মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাঁরা সম্পর্কের দিক দিয়ে আশ্রিতার নিজের ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, দূর সম্পর্কের চাচা এবং ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থাপন্ন সদস্য।

পরিত্যক্তা মহিলাগণ নিজের বাড়ীতে অথবা অন্যের বাড়ীতে আশ্রিতা অবস্থায় থেকেও আয়ের উৎস হিসেবে পশু-পাখী সযত্নে পালন করে থাকে। গৃহ পালিত পশু-পাখীর মধ্যে ছাগল এবং হাঁস-মুরগী রয়েছে। মহিলাদের শিক্ষাগত মান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, অশিক্ষিতা রয়েছে ৮ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে ৪ জন, নাম সই ২ জন, মক্তব শিক্ষায় শিক্ষিত ৮ জন। পরিতক্তা মহিলারা প্রধান পেশা ও সহযোগী পেশায় নিয়োজিত আছেন। প্রধান পেশার মধ্যে রয়েছে ঃ অন্যের বাড়ী কাজ, ভিক্ষাবৃত্তি, জ্বালানী সংগ্রহ করা, রাস্তায় মাটি কাটা ইত্যাদি। সহযোগী পেশাগুলো ঃ হাঁস-মুরগী পোষা, আশ্রয়দাতার ঘরের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। সন্তানাদির বিবরণে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সন্তান সংখ্যা ৬ জন এবং সর্বনিম্ন সন্তান সংখ্যা ২ জন। সন্তানদের কোথায় অবস্থিতি-এই প্রসংগে জানা যায় যে, মায়ের কাছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক থাকে এবং বাবার কাছে সবচেয়ে কম সংখ্যক থাকে।

পরিত্যক্তা মহিলারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে কাটাবে জিজ্ঞাসা করায় যেসব মত পাওয়া গেছে ঃ পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছুক, অন্যের বাসায় কাজ করে খাবে, সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ধান-চালের ব্যবসা করবে, রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করবে, পিতার সম্পত্তির অংশ দিয়ে সংসার চালাবে ইত্যাদি।

পরিত্যক্তা মহিলারা যেখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে সেই আশ্রয়দাতাদেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যেমন ঃ আশ্রয় দাতার বয়স, আশ্রয়দাতার সাথে অশ্রিতার সম্পর্ক, আশ্রদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, জমি-জমার বিবরণ, গৃহ পালিত পশু-পাখী, ঘর-বাড়ীর ধরণ ইত্যাদি। আশ্রয়দাতার সাথে আশ্রিতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঃ পিতা, মাতা, ভাই, ছেলে, জামাই, আত্মীয়ের কাছেই পরিত্যক্তা মহিলারা আশ্রয় নিয়েছেন।

অধ্যায়-৩ এ ১০ জন পরিত্যক্তা মহিলার আত্ম-সমীক্ষাতেই মহিলাদের জন্ম তারিখ, পড়ালেখা, বাড়ীঘরের অবস্থান, মহিলা তাঁর পিতৃ গৃহে কত নম্বর সন্তান, বিবাহ কত বৎসরে হয়, বিয়ের ধরণ কেমন ছিল, (অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিয়ে অথবা ছেলে এবং মেয়ের নিজেদের পছন্দের বিয়ে) যৌতুক ছিল কি'না, থাকলে কি কি, সন্তান সংখ্যা কতজন, বিবাহের কতদিন পর তালাক পেয়েছে, তালাক পাবার পর মহিলা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন, কোথায়, কার কাছে আশ্রম নিয়েছেন, ভবিষ্যৎ জীবনের দিনগুলো কাটানোর জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন ইত্যাদি বিষয়গুলো কেসষ্টাডিতে স্থান পেয়েছে।

ঘ) পর্যবেক্ষণ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উভয় গ্রামেই পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। উভয় গ্রাম থেকেই তথ্য সংগ্রহের সময় মহিলাদের কাছ থেকে এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া পাওয়া গেছে। অনেকেরই অভিযোগ তাদের কাছে কেউ আসে না শুনতে বা জানতে এমনকি "কেমন আছি" এই ছোট কথাটিও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করে না। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমী থেকে যখন তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া হয়েছিল মনে হয়েছে-পরিত্যক্তা মহিলারা যেন বহুদিনের পুঞ্জীভুত দুঃখ-বেদনা বলতে পেরে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করছে। সমাজ তাদের ঘৃণা করে, খারাপ চোখে দেখে এক কথায় সমাজের চোখে তারা হেয়। তথ্য সংগ্রহকালে মহিলাদের ভেতর যে জিনিসটি লক্ষ্য করা

গেছে ঃ স্বামী যত অত্যাচার, অবহেলা,অনাদর করুক না কেন তার কাছেই থাকতে হবে। প্রহার করলেও ভাবতে হবে-এটা মেয়ে মানুষের জীবনে পাওনা, নিত্য-দিনের ঘটনার মত একটি ঘটনা যা কারো কাছে বলার নয়, প্রতিবাদযোগ্য নয়। এগুলোকে মেনে নিয়েই স্বামীর সংসারে থাকতে হবে।

গবেষণাভুক্ত গ্রাম দু'টিতে কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে না নিলেও অনেকেরই স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ দানকারীনি ২২ জন পরিত্যক্তা মহিলার মধ্যে সর্বোচ্চ বয়স রয়েছে ৫০ এবং সর্বনিম্ন বয়স রয়েছে ২০ বৎসর। তবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্যা রয়েছে ২৬ থেকে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে, এক্ষেত্রে বেশী পরিত্যক্তা হওয়ার মূলে রয়েছে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে যৌতুক বেশী পাওয়ার আশা।

বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার সার্বিক ভাবে কম। তার উপর সাক্ষাৎদানকারীনিরা ছিলেন মহিলা। তদুপরি গ্রাম বাংলার মহিলা। কাজেই শিক্ষার হার সেখানে কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। এই কারণেই তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা গেছে যে, গ্রাম-বাংলার মহিলারা অন্যান্য উন্নত বিশ্বের তুলনায় স্বামীর সংসারে অনেকে অত্যাচার নীরবে সহ্য করেও থেকে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরেও যখন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না নিজে, তখনই পরিত্যক্তা হওয়ার পথ বেছে নেয়। সুতরাং এই নিয়ম থেকে গবেষণাভুক্ত গ্রাম দু'টিও বাদ পড়েনি।

স্বামীর ঘর থেকে যারা পরিত্যক্তা হয়ে এসেছে তাদের কারোই স্বচ্ছলভাবে চলার মত বিষয় সম্পদ নেই। কিছু জমি রয়েছে ২ জনের, সেগুলোও উপর্জনক্ষম ছেলে না থাকার কারণে জমি বর্গা দিয়েছে। অবশিষ্ট মহিলারা কাজের মেয়ের কাজ, মাটি কাটার কাজ, জংগল থেকে কাঠ কেটে এনে তার মাধ্যমে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করছে। আশ্রয়দাতাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। সুতরাং পরিত্যক্তা মহিলাদের উদয়স্ত পরিশ্রম করে অর্থের সংস্থান করতে হয়। তাই কখনো ভরপেট, কখনো আধপেট, কখনো বা উপবাস করে দিন কাটাতে হয়।

তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে গ্রামের তথা কথিত শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিভিন্ন মন্তব্য শোনা গেছে। এর সাহায্যে প্রতীয়মান হয়েছে এই সমস্ত মহিলাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভংগী কেমন। পরিত্যক্তা মহিলাদের দেখলেই প্রায়ই যে কথাটি শোনা গেছে "বেপর্দা চলাফেরা"।